ইতি গজ

রজত শুভ্র কর্মকার

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

ভূমিকা

কথায় আছে মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। এই লেখাটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যেভাবে শুরু করেছিলাম আদপেও সেটা হয়নি, এই গল্প কিভাবে এগিয়েছে সে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। একটা সময় মনে হয়েছিল চরিত্ররা নিজেরাই যেন ঠিক করছে তারা কীভাবে এগিয়ে যাবে। অতএব আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমি এখানে লেখকের বদলে একজন দর্শকের ভূমিকাই পালন করেছি মাত্র। তবে হ্যাঁ, যেই ভাবনাটা নিয়ে এগোনো শুরু করেছিলাম সেটাই ঠিক করেছে এই গল্পের গতিপ্রকৃতি কেমন হবে। আর সেটা হলো একটা প্রশ্ন। এই ব্রহ্মাণ্ডে সবচেয়ে বড় অভিশাপ কী হতে পারে? উত্তর আমার কাছে একটাই ছিল, অমরত্ব। ভাবুন একবার, একটা মানুষ, সে বেঁচে আছে, কিন্তু তার কাছের মানুষগুলো কেউ বেঁচে নেই আর। সবাই চলে গেছে এক এক করে। সে দেখছে এই পৃথিবীকে একটু একটু করে শেষ হতে। সে মৃত্যুর কাছে পালাতে চাইছে কিন্তু পালাতে পারছেনা। অমরত্ব তাকে পালাতে দিচ্ছেনা। এই জীবন একটা জেলখানায় পরিণত হয়েছে, সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত তাকে থাকতেই হবে এই জেলখানায়। এর থেকে মুক্তির উপায়? উপায় একটাই। প্রলয়!

এরকমই এক চরিত্র যে অমরত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত, তার অবস্থা লেখা হয়েছে এখানে। নিজেকে হারিয়ে ফেলা একটা মানুষ যে খুঁজে পেয়েছে নিজের আসল সত্তাকে, তার কথা উঠে এসেছে এখানে। আর শেষ হয়েও শেষ না হওয়ার উদগ্র ইচ্ছের কথা আছে এখানে। এখানে মানে এই ফ্যান্টাসি উপন্যাসটিতে, যেটি বের করার দুঃসাহস করেছে ওই বিশেষ ব্যক্তিটি যাকে আমি বসম্যান বলি। লেখাটির জন্য আমি বিশেষ ধন্যবাদ দেব আমার বন্ধু ডক্টর রেনি অজয়কে, যার কাছ থেকে মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ পেয়েছি।

আর হ্যাঁ, এটি সম্পূর্ণভাবে একটি ফ্যান্টাসি উপন্যাস, কোনো ঘটনা বা চরিত্রর সঙ্গে মিল পেলে সেটা নিছকই কাকতালীয় এবং অনিচ্ছাকৃত। এখানে বর্ণিত সকল ঘটনাবলীকে পরিনতমনস্ক পাঠকেরা কাল্পনিক হিসেবে ধরে নেবেন, এটুকুই আশা করবো।

প্রাককথন

(সাত বছর আগে কোনো একদিন)

"কিসি কি মুসকুরাহাটো পে হো নিসার
কিসি কা দর্দ মিল সকে তো লে উধার,
কিসিকে ওয়াস্তে হো তেরে দিল মে প্যায়ার
জিনা ইসি কা নাম হ্যায়।"

নিজের মনে গুনগুন করতে করতে ঝোপজঙ্গল ভেঙে এগোচ্ছিলেন ডক্টর কৃপাশংকর পাণ্ডে। বয়স চল্লিশের আশেপাশে, পেশায় ডাক্তার, নেশায় সমাজসেবী। দেশের হেন প্রান্ত নেই যেখানে ভদ্রলোক ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প করেননি। কখনও সরকারি সহায়তায়, আবার কখনও বা নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে চলে যান দুঃস্থ রোগীর চিকিৎসা করতে। আজ যেমন ভদ্রলোক যাচ্ছেন দণ্ডকারণ্যের ভেতরে এক উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। সঙ্গে রয়েছেন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, তাঁর নাম রামচরণ সাহু। তিনি বয়ে চলেছেন ডক্টর কৃপাশংকর পাণ্ডের ওষুধের ব্যাগ এবং অন্য জিনিস। তিনি আগে আগে চলছেন আর তাঁর পেছনেই গুনগুন করতে করতে এগিয়ে আসছেন ডক্টর পাণ্ডে।

ডক্টর পাণ্ডে জিজ্ঞেস করলেন পেছন থেকে, "আর কত দূর যেতে হবে চরণবাবু?"

রামচরণ হাসলেন, "বেশি না আর কয়েক মিনিট, এই তো চলেই এলাম।"

"সেই কতক্ষণ ধরে কয়েক মিনিট কয়েক মিনিট করে যাচ্ছেন। আর আমরা জঙ্গলের মধ্যে এই রাস্তা ধরে হাঁটছি তো হাঁটছিই। আর কাঁহাতক চলা যায় চরণবাবু?" বলে উঠলেন কৃপাশংকর পাণ্ডে।

"ওই যে দেখুন, ওই যে ধোঁওয়া উঠছে ওই দূরে। ওখানেই। চলে এসেছি আমরা।" হেসে বললেন রামচরণ।

চোখ মেলে দেখলেন কৃপাশংকর, ওই তো দূরে একটা গ্রামের মতো দেখা যাচ্ছে। প্রবল উৎসাহে এগিয়ে গেলেন ডক্টর পাণ্ডে। পেছন পেছন এলেন রামচরণ সাহু।

গ্রামের ভেতরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চোখে পড়ল একটা প্রবল জটলা। একটা বহু পুরোনো গাছের তলায় একটা রুগ্ন দেখতে লোককে বেঁধে লাঠি দিয়ে বেদম পিটিয়ে যাচ্ছে কতগুলো স্থানীয় লোক।

ডক্টর পাণ্ডে দেখে হতবাক হয়ে গেলেন, তিনি রামচরণকে বললেন, "এ কী হচ্ছে এটা? চলুন তো গিয়ে দেখা যাক?"

রামচরণ সামনে এগিয়ে স্থানীয় ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস করতে ভিড়ের থেকে একজন বয়স্ক দেখতে ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। দেখলে মনে হবে সে এই গ্রামের মুরুব্বি গোছের কেউ। সেই মুরুব্বি ভদ্রলোক স্থানীয় ভাষায় রামচরণের কথার উত্তর দিলেন। আর সে এক কথা দু কথা নয়। অনেক অনেক কথা।

সব কথা শুনে রামচরণ একটু চমকে গেলেন যেন, তিনি বললেন, "এই যে লোকটিকে দেখছেন ডাক্তারবাবু, সবাই বলে এই লোকটি নাকি অমর। এর মধ্যে নাকি দানো বাস করে। এই লোককে এই গ্রামের সবচেয়ে বুড়া আদমিও একদম ছোটবেলা থেকে নাকি এই লোকটাকে দেখে আসছে। একে সবসময় একটা ঘরে বন্দি করে রাখা হয়। আজ কোনোভাবে নাকি বেরিয়ে গিয়েছিল, একটা বাচ্চা ছেলেকে ঘায়েলও করেছে।"

ডক্টর পাণ্ডে দেখছিলেন ওই লোকটিকে, আপাতদৃষ্টিতে দেখে বয়স ষাটের আশেপাশে মনে হয়। মার খেয়ে নেতিয়ে গেছে বেচারি। ডক্টর পাণ্ডে এগিয়ে গিয়ে কব্জিটা ধরলেন। তারপর তিনি রামচরণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পালস নেই, এই লোক আর বেঁচে নেই।"

রামচরণ এই কথা স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করতেই উপস্থিত জনতার মধ্যে যেন আলোড়ন বয়ে গেল। তাদের মধ্যে আনন্দ, আশঙ্কা এবং অবিশ্বাসের একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। ইতিমধ্যে সেই মুরুব্বি ডক্টর পাণ্ডের পরিচয় জানতে পেরেছে। ডক্টর পাণ্ডে যে এখানে একটা ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প করতে চান শুনে সেই মুরুব্বি খুবই আহ্লাদিত বলেই মালুম হচ্ছে। হঠাৎ ডক্টর পাণ্ডে জানতে চাইলেন সেই বাচ্চাটির সম্পর্কে, যাকে এই দানোয় পাওয়া লোক ঘায়েল করেছিল। মুরুব্বি জানতে পেরে যা বলল শুনে ডক্টর পাণ্ডের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। রামচরণের করা অনুবাদ অনুযায়ী, এই গ্রামের লোকেদের নাকি বলা রয়েছে কোনোভাবেই যেন এই মৃত লোকটির কাছে কেউ না যায়, আর কেউ যদি যায়ও তাকে একদম টানা একবছর বন্দি অবস্থায় থাকতে হবে। তাকে কেউ কিছু খেতেও দিতে পারবে না। ওই বাচ্চা ছেলেটিকেও এখন বন্দি থাকতে হবে।

ডক্টর পাণ্ডে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "যতক্ষণ না এরা আমাকে সেই ছেলেটির কাছে নিয়ে যাচ্ছে আমি এখানে মেডিক্যাল ক্যাম্প করব না। এখানকার একটা মানুষও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হলে সেটা একটা ক্রাইম হবে। ব্যস।"

মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশটা থমথমে হয়ে গেল। এলাকার মানুষজনের মধ্যে একটা গুঞ্জন দেখা দিল। মুরুব্বি ভদ্রলোক তখন ইশারা করলেন তাঁদের পিছু পিছু আসার জন্য। কৃপাশংকর এবং রামচরণ দুজনেই মুরুব্বির পিছু নিলেন। বেশ কিছুটা আসার পর গ্রামের এক কোনায় একটা মাটির ঘরের সামনে দাঁড়ালেন দুজন, ঘরের দরজা আটকানো, বাইরের দাওয়ায় মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন

একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। মহিলা বোধ হয় বাচ্চাটির মা, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে রীতিমতো। মুরুব্বি সামনে এগিয়ে গিয়ে কিছু বলতেই সেই পুরুষ এবং মহিলা এসে কৃপাশংকরের পায়ে এসে পড়লেন রীতিমতো। কৃপাশংকর কোনোভাবে তাঁদের শান্ত করে ঢুকলেন ঘরে। প্রায়ান্ধকার ঘরে ঢুকতে চোখে পড়ল ছেলেটিকে। ঘরে এমনিতে কোনো আসবাব নেই, একটা চাটাই পাতা আছে শুধু, ছেলেটি সেই চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছে। কৃপাশংকর এগিয়ে গেলেন সেদিকে, ছেলেটির কপালে হাত রাখলেন তিনি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে রীতিমতো। পাশে রাখা কুঁজোটা টেনে নিলেন তিনি, সেখান থেকে জল হাতে ঢালতে গিয়ে দেখলেন তাতে জল নেই। জলের জায়গায় রয়েছে একটা অদ্ভুত দেখতে তরল পদার্থ। মুখে দিতেই বুঝলেন সেটা কী। পিটুলি গোলা জল!

"ছোট থেকে এটা খেয়েই বড় হয়েছি, তাই এটাই আমাকে এরা দেয়। খাবে?"

বিকৃত গলাটা শুনতেই চমকে পাশের দিকে তাকালেন কৃপাশংকর। দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুক কেঁপে উঠল, ছেলেটি উঠে বসে রয়েছে, তার মুখে ফুটে উঠেছে একটা অদ্ভুত পৈশাচিক হাসি।

কৃপাশংকর পাণ্ডে অবাক হয়ে তাকালেন, "তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি? আর তোমার গলা এরকম বিকৃত কেন?"

ছেলেটি হেসে উঠল, "সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আমাকে এই গ্রাম থেকে বেরোতে হবে। আমাকে বাইরে বেরোতে হবে। অনেক কিছু করার আছে আমার। এরা আমাকে বেরোতে দেয় না। আমাকে মুক্ত করবে তুমি?"

ডক্টর পাণ্ডে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি?"

বিকৃত গলা ভেসে এল, "সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এবার যেটা আমি করতে যাব সেটা।"

ডক্টর পাণ্ডে কিছু বোঝার আগেই ছেলেটি ঝাঁপিয়ে পড়ল ডক্টর পাণ্ডের ওপর, আর সে কামড়ে ধরল ডক্টর পাণ্ডের ডান হাত। কোনোরকমে তিনি ছেলেটিকে ছাড়াতে সক্ষম হলেন। ছেলেটির ধারালো দাঁত ডক্টর পাণ্ডের হাত থেকে বেশ কিছুটা মাংস খুবলে নিয়েছে তখন। নিজের হাতের মধ্যে ব্যান্ডেজ করতে করতে দেখলেন ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে, তার শরীরের তাপমাত্রাও নেমে গেছে। তিনি ছেলেটিকে কোনোরকমে হাতে তুলে নিয়ে বাইরে এলেন। তিনি রামচরণের সাহায্যে ছেলেটির বাবা এবং মা'কে বললেন যে, আর কোনো ভয় নেই, তাঁদের ছেলের শরীরের দানো ছেলের শরীর ছেড়ে চলে গেছে। ছেলেটির বাবা এবং মায়ের মুখে যেই আনন্দটা দেখেছিলেন ডক্টর কৃপাশংকর সেটা তিনি আর কোথাও দেখেননি। তিনি ছেলেটির বাবা-মা'কে জ্বরের ওষুধ দিয়ে সেটা কখন কীভাবে খেতে হবে সেটাও বলে দিলেন। এলাকার লোকজনের মধ্যে একটা

আনন্দ দেখা যাচ্ছিল।

এত কিছুর মধ্যেও ডক্টর পাণ্ডে টের পাচ্ছিলেন যে, কিছু একটা হয়েছে তাঁর। তাঁর মাথা প্রচণ্ড দপদপ করছে এবং শরীর যেন ঘামতে শুরু করেছে।

এর মধ্যেই সেই মুরুব্বি এসে রামচরণের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করল, "আপনার হাতে ওটা কী?"

ডক্টর পাণ্ডে বললেন, "এটা একটা ব্যান্ডেজ, একটু ছড়ে গেছে মাত্র।" তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা আমার একটু ঘুমনোর ব্যবস্থা করা যায়? আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"

মুরুব্বি তাঁকে পাঁচমিনিটের হাঁটা পথের দূরত্বে একটা বাড়িতে নিয়ে গেল, সেখানেই তাঁদের থাকা এবং খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

ডক্টর পাণ্ডে কোনোরকমে ঘরের ভেতর গিয়েই নিকানো মেঝেতে পাতা একটা মাদুরের ওপর শুয়ে পড়লেন, আর তাঁর চোখের সামনে নেমে এল অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে ডক্টর পাণ্ডে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এক অদ্ভুত শূন্যস্থানে, তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে একটা বিকৃত আওয়াজ, 'সমর্পণ করো হে মানবসন্তান। আমার আদেশের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তোমার অন্তত নেই। অতএব সমর্পণ করো।'

ডক্টর পাণ্ডে এই আওয়াজের অভিঘাত সামলাতে পারলেন না, তিনি হাঁটু গেঁড়ে যেন বসে পড়লেন আর বললেন, "আমি করলাম সমর্পণ।"

সেই আওয়াজটা গিলে ফেলল ডক্টর কৃপাশংকর পাণ্ডেকে, নিজের চেতনা বিলুপ্ত হওয়ার আগে তিনি শুনতে পেলেন, 'প্রলয় আসবে এবার। অবশেষে আসবে প্রলয়।'

###

পরেরদিন আর সেই মেডিক্যাল ক্যাম্প হয়নি। ডক্টর কৃপাশংকর পাণ্ডে উধাও হয়ে যান, এবং সেই আগের রাতেই গ্রামে একটা নারকীয় হত্যাকাণ্ড হয়ে যায়। যারা যারা আগের দিন ওই 'দানোয়' পাওয়া লোকটিকে গাছের তলায় বেঁধে পিটিয়েছিল তাদের সবার মৃতদেহ পরেরদিন সকালে পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য তাদের মধ্যে মুরুব্বিও ছিলও। কিন্তু সবচেয়ে হতবাক করা এবং ভয় পাওয়ানো ঘটনা নিঃসন্দেহে রামচরণ সাহুর গলা মুচড়ে পরে থাকা মৃতদেহের আবিষ্কার হওয়া। রামচরণ সাহুর চোখে ভয় এবং বিস্ময় দুটোই একসঙ্গে ফুটে উঠেছিল।

দেখতে দেখতে সেই গ্রামটা জনমানবহীন হয়ে গেল। বোধ হয় তাদের নিদান দেওয়া ছিল আগেই যে, ওই দানো যদি কোনোভাবে বেরিয়ে পরে তারা যেন সেই জায়গা সারাজীবনের জন্য ছেড়ে দেয়। গ্রামে পড়েছিল কিছু মৃতদেহ, আর একটা

দমবন্ধ করা নীরবতা। যদি কেউ চেষ্টা করত তাহলে শুনতে পেত সেই নীরবতার মধ্যে লুকিয়ে ডক্টর কৃপাশংকর পাণ্ডের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা বিজাতীয় গলার ফিসফিসে আওয়াজ, "এবার আসবে মুক্তি। অভিশপ্ত জীবন থেকে আসবে মুক্তি। প্রলয় আসবে এবার।"

।।১।।

(বর্তমান সময়ঃ দুপুর তিনটে)

অমরত্বের সন্ধান অনেকে করেছে, কেউ কেউ পেয়েছে, কেউ পায়নি, কিন্তু অমরত্বকে কি ভালো কিছু হিসেবে ধরা যায়? কেমন হবে যদি কেউ অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকে আর চোখের সামনে এক এক করে তার কাছের মানুষেরা চলে যেতে থাকে? কেমন হবে তখন? মৃত্যু তার কাছে আসবে না, কারণ, সে অমর! তাহলে অমরত্ব আশীর্বাদ না অভিশাপ? লাইব্রেরি থেকে আসতে আসতে এসব ভাবছিলেন ডক্টর বোধিসত্ত্ব নাগ। পেশায় একজন সাইকায়াট্রিস্ট, এই কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্রে তাঁর চেম্বার, মোটামুটি ভালোই পসার, সপ্তাহে তিনদিন চেম্বার খোলা থাকে তাঁর, আর বাকি তিনদিন তিনি কাটিয়ে দেন লাইব্রেরিতে। বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালোবাসেন, মনস্তত্ত্ব ছাড়াও অনেক বিষয়ের ওপর তাঁর আগ্রহ রয়েছে, বিজ্ঞান থেকে শুরু করে ইতিহাস, সাহিত্য হেন বিষয় নেই যা নিয়ে উনি পড়াশোনা করেন না। আর বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের নিজস্ব উপকথা এবং পুরাণের ওপর তাঁর ভীষণ আগ্রহ। বিয়ে-থা করেননি, করার কথা মনেও আসেনি। মাঝেমাঝেই যখন একাকিত্ব গ্রাস করে, তখন উনি এই বিষয়গুলো নিয়ে আবার পড়াশোনা করা শুরু করেন, মনে হয় যেন তাঁর বইয়ের পাতা থেকে চরিত্রগুলো উঠে এসে তাঁর সামনে সেই পুরো ঘটনাগুলো অভিনয় করে দেখায়। কখনও ডক্টর নাগ দেখতে পান, গিলগামেশ মৃত্যুসাগরের তলা থেকে জীয়নলতা তুলে এনে বন্ধু এনকিদুকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। একটি সাপ এসে খেয়ে যায় সেই জীয়নলতা আর ফেলে যায় বার্ধক্যের চিহ্নস্বরূপ সেই খোলস। কখনও বা চোখের সামনে অর্ফিয়াসকে দেখতে পান পাতালপ্রবেশ করতে, যাতে সে ইউরিডিসকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। আজ যেমন তিনি দেখছিলেন অশ্বত্থামাকে শ্রীকৃষ্ণ অভিশাপ দেওয়ার সময় বলছেন যে, অশ্বত্থামাকে সমগ্র মানবজাতির ভার বহন করতে হবে, তাকে উন্মাদের মতো জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলতে হবে। শরীরে দগদগে ঘা আর ক্ষত নিয়ে এক দুর্বিষহ জীবন সে অতিবাহিত করবে কলিযুগের শেষ অবধি। এমনই সে অভিশপ্ত জীবন যে মৃত্যুও অশ্বত্থামার কাছে আসবে না! তিনি ভাবছিলেন অশ্বত্থামা কি অশরীরী বেশে সত্যিই আজও নর্মদা নদীর তীরে ঘুরে বেড়ান?

প্রশ্নগুলো সহজ হলেও, উত্তর অজানা।

এই করেই দিন কেটে যায়, গঙ্গার ধারের সাতপুরুষের বাড়িটা প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে এখন। এমনিতেই ডক্টর নাগ নিজে আপনভোলা মানুষ, কেয়ারটেকার মহেশের ওপর ভরসা করেই চলেন। বাড়ির কোথায় কী রয়েছে না রয়েছে, কে আসল কে না আসল, কোনো খবর এল কী না এল এই সব খুঁটিনাটি ব্যাপার মহেশ নিজেই একার হাতে সামলে নেয়। ঠিক যেভাবে আজ ঘরে আসতেই মহেশ বলা শুরু করল, "আর বলবেন না কাকাবাবু, আজ হঠাৎ গিয়েছিল কারেন্ট চলে। এই গরমে ফ্যান ছাড়া থাকা যায় নাকি! ছ'মাস হল আপনার এখানে কাজ করছি কিন্তু কোনোদিন কারেন্ট যেতে দেখিনি বটে! তা কারেন্টের আপিসে করলুম ফোন, আর বিশ্বাস করবেন না আধা ঘণ্টার মধ্যে দুটো লোক চলে এল। খুব করিৎকর্মা লোক মাইরি, আসার সঙ্গে সঙ্গে কী সব খুটখাট করতেই কারেন্টও চলে এল। কী সব সার্কিট-ফার্কিট বিগড়ে বসে ছিল! আমি বলি কী, বাড়িটাকে আবার ঢেলে সাজান। অনেক বছরই তো হল।"

ডক্টর নাগ হাসলেন, ছেলেটার এই স্বভাব, মেল ট্রেনের গতিতে কথা বলে যাবে। যা যা বলবে তার মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জোগাড় করে নিতে হবে। আগের কেয়ারটেকার সনাতন খুব কাজের লোক ছিল ঠিকই, কিন্তু ছ'মাস আগে সে হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। তবে যাওয়ার আগে বহাল করে দিয়ে যায় মহেশকে। সেই থেকে ছেলেটি এখানেই আছে, আর ডক্টর নাগ ছেলেটিকে পেয়ে বেশ ভালোই আছেন। এতটা খেয়াল সনাতনও রাখত না এই নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

জুতোটা খুলে র‍্যাকের মধ্যে রাখতে রাখতে মহেশের গলা আবার ভেসে এল, "আর হ্যাঁ কাকাবাবু, দিল্লি থেকে একজন দেখা করতে এসেছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বসে আছে ওই বসার ঘরে।"

ঘড়ি দেখলেন ডক্টর নাগ, সময় হয়েছে দুপুর তিনটে। এই সময় তো কারোর আসার কথা ছিল না! ভুরু কুঁচকে তাকালেন ডক্টর নাগ, "অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিস্টে নাম আছে?"

"আজ্ঞে না।"

"আগে এসেছিল কখনো? আমার তো মনে থাকে না আজকাল কে আসে আর কে আসে না!"

"না কাকাবাবু, এ নতুন লোক, আগে আসেনি! এরকম গুঁফো লোক বাড়িতে এলে মনে থাকবে না আবার?"

ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখলেন মহেশ কথাটা নেহাত ভুল বলেনি, এরকম জাঁদরেল গোঁফ সত্যিই দেখা যায় না। ভদ্রলোকের উচ্চতা হয়তো মেরে কেটে সাড়ে পাঁচ ফুট হবে, কিন্তু চেহারার মধ্যে এমন একটা কাঠিন্য আছে, যেটা সহজে চোখে

পড়ে না। ভদ্রলোক সোফায় বসে সামনের টেবিলে রাখা একটা পেপারওয়েট হাতে তুলে দেখছিলেন মন দিয়ে। সামনাসামনি হতেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে ঝরঝরে বাংলায় বলেলেন, "নমস্কার ডক্টর, অসময়ে এসে আপনাকে একটু ব্যতিব্যস্ত করলাম।"

ডক্টর নাগ কিছুটা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন, "কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখে কিন্তু শুরুতে বাঙালি মনে হয়নি।"

ভদ্রলোক হাসলেন, "না মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। বাবা-মা দুজনেই রাজস্থানের। বাবা এখানে আমলা ছিলেন, এবং মা ছিলেন একটা স্কুলের টিচার। আর আমার স্কুলের পড়াশোনাও বলতে গেলে প্রায় পুরোটাই এখানে। সেই আড়াই বছর বয়সে এই শহরে আসি, তারপর ছিলাম প্রায় পনেরো বছর। বাংলা লিখতে-পড়তে দুটোই পারি।"

"আচ্ছা আচ্ছা। দাঁড়ান মহেশকে বলি কিছু একটা আনার জন্য।"

"তার দরকার হবে না। আপনার ভৃত্যটি আমাকে এক গ্লাস ঘোলের শরবত খাইয়ে দিয়েছে।"

"আচ্ছা বেশ বেশ।" একটু হাসলেন ডক্টর নাগ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন "বলুন কী করতে পারি আপনার জন্য?"

"তার আগে আমার পরিচয়টা দেই, আমি স্পেশ্যাল ফোর্স থেকে মেজর ধর্মরাজ সিংহ। আর ডক্টর একটা বিশেষ দরকারে আপনার কাছে আসা।" বলে ভদ্রলোক একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন ডক্টর নাগের দিকে।

সেটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ মন দিয়ে দেখলেন ডক্টর নাগ, বিস্ময়টা চাপা রইল না তাঁর কণ্ঠস্বরে "কী ব্যাপার?"

পেপার ওয়েটটা তুলে সেটাকে হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে মেজর সিংহ সামনে তাকালেন, "আপনার কাছে একজন এক্স আর্মি অফিসার আসত কাউন্সেলিংয়ের জন্য, মনে আছে? লেফটেন্যান্ট রুদ্র দেব?"

মনে পড়ল ডক্টর নাগের, রুদ্র দেব, বয়স তিরিশের আশেপাশেই হবে, হাইলি ডেকোরেটেড অফিসার। পোস্ট ট্রম্যাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারের জন্য আসত।

তিনি মেজর সিংহের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ মনে আছে, সে তো প্রায় এক বছর আগের কথা! আমার কাছেই থেরাপির জন্য আসত। দু'দফায় প্রায় আটবার এসেছিল আমার কাছে।"

মেজর সিংহ সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন, "রুদ্র আমাদের একটা এলিট কম্যান্ডো ইউনিটের অংশ ছিল, আমি ওর কম্যান্ডিং অফিসার ছিলাম, ওকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমিই ওকে বলি আপনার কাছে আসার জন্য। একজন মনস্তত্ত্ববিদ এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার কাজ সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। বিশেষ করে পিটিএসডি-র ওপর আপনার রিসার্চ ওয়ার্কের কথা তো সবাই জানে। আপনি ড্রাগ অ্যাডমিনিস্টার করার সঙ্গে সাইকোথেরাপির

নজর দিয়ে থাকেন, ঠিক বলছি তো ডক্টর?"

ডক্টর নাগ মাথা নাড়লেন, "সেটাই করে থাকি আমি সাধারণত, তা আপনি রুদ্রর ব্যাপারে কিছু বলছিলেন?"

মেজর সিংহ পেপার ওয়েটটা টেবিলে রাখলেন, একটা ঠক করে আওয়াজ হল,

"আজ ছ'মাস হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট রুদ্র উধাও হয়ে গেছে।"

শুনে একটু চমকে উঠলেন ডক্টর নাগ, "কী বলছেন?"

মেজর সিংহ যেন কথাটা শুনেও শুনলেন না, "আর আপনি আশা করি জানেন ঠিক ছ'মাস আগে আমাদের দেশের আর্মি চিফের হঠাৎ ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হয়?"

"হ্যাঁ, সেটার খবর প্রিন্ট আর টেলিভিশন মিডিয়াতে যেভাবে দেখানো হয়েছিল, সেটা বেশ মনে আছে। অসুস্থতার কারণে মৃত্যু হয়েছিল তাই না?"

মেজর সিংহ হাসলেন একটু, "অসুস্থতা? সেটা খবরে বলা হয়েছে, এটাই স্বাভাবিক নয় কি ডক্টর? আশা করি এটা আপনি বুঝতে পারেন, কোন খবরটা কীভাবে দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হয়? না হলে একটা চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে ডক্টর।"

ডক্টর নাগ মাথা নাড়লেন, না বোঝার কিছু নেই।

মেজর সিংহ বললেন, "আসল ঘটনা হল, আর্মি চিফ জেনারেল ধৃষ্টদ্যুম্ন রাওকে ঘুমের মধ্যে মারা হয়েছে, এবং সেটা খুব ব্রুটালি মারা হয়েছে। আর এর পেছনে আমার সন্দেহ রুদ্র জড়িত আছে।"

ডক্টর নাগ জিজ্ঞেস করলেন, "যদি এটা অ্যাসাসিনেশন হয়েও থাকে তার সঙ্গে আপনি রুদ্রকে জুড়ছেন কী করে? এটা তো অন্য কেউও করতে পারে?"

মেজর সিংহ তাকালেন ডক্টর নাগের দিকে, "তার আগে রুদ্রর সম্পর্কে একটা জিনিস বলুন তো ডক্টর, যেটা শুধু মাত্র ওর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, আর কারোর ক্ষেত্রে নয়?"

ডক্টর নাগ মনে করার চেষ্টা করলেন ছেলেটিকে, উজ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রং, লম্বা, চোখে-মুখে একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতা মাখা। তারপরেই পরে মনে পড়ল, হ্যাঁ, একটা ব্যাপার ছিল ওর মধ্যে যেটা সবার থেকে আলাদা। ডক্টর নাগ মেজর সিংহের দিকে তাকালেন, "রুদ্রর একটা ইউনিক ব্যাপার মনে আছে, ও একটা পারফিউম ব্যবহার করত খুব। ওর রুমালে সেই পারফিউমের গন্ধ পাওয়া যেত, আর মাঝেমাঝে ও সেটাকে নাকের কাছে ধরত। কিন্তু কীসের পারফিউম সেটা ঠিক মনে আসছে না।"

মেজর সিংহ বললেন, "স্যান্ডালউড, চন্দনের গন্ধযুক্ত পারফিউম। আর সেই পারফিউম ও নিজেই বানাত।"

চন্দনের গন্ধ, ঠিক! ডক্টর নাগের মনে পড়েছে এবারে। একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন রুদ্রকে, এই ধরনের সুগন্ধির প্রতি আসক্তির ওর কারণ কী, উত্তরে